অপরাধ ও শাস্তি

ফিওদর দস্তইয়েফ্স্কি

অনুবাদ
আকবরউদ্দীন

অবসর

ভূমিকা

রুশ সাহিত্যে অসামান্য সৃজনশীলতা নিয়ে এসেছিল ১৮৬০-এর দশকটি। ১৮৬২-তে বেরোয় তুর্গেনিভের 'ফাদার্স অ্যান্ড সন্স'। ১৮৬৪-তে প্রকাশিত হয় দস্তইয়েফ্স্কির 'নোটস ফ্রম আন্ডারগ্রাউন্ড', ১৮৬৬-তে 'ক্রাইম অ্যান্ড পানিশমেন্ট'। এর তিন বছর পর ১৮৬৯-এ একই বছরে বেরোয় দস্তইয়েফ্স্কির 'ইডিয়ট' আর তল্স্তোয়ের মহাকাব্যিক আখ্যান 'ওয়ার অ্যান্ড পিস'। এই দশকে তুর্গেনিভ, দস্তইয়েফ্স্কি ও তল্স্তোয়ের আরো কিছু বিখ্যাত রচনা বেরিয়েছে। তুর্গেনিভের 'ফার্স্ট লাভ' (১৮৬০), 'স্মোক' (১৮৬৭) তল্স্তোয়ের 'কসাক' (১৮৬৩) বা দস্তইয়েফ্স্কির 'হিউমিলিয়েটেড অ্যান্ড ইনসাল্টেড' (১৮৬১), 'দ্য হাউস অব দ্য ডেড' (১৮৬২), 'গ্যাম্বলার' (১৮৬৭) ইত্যাদির কথা এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়।

সাহিত্যের দুনিয়ার এই উথালপাথাল ভীষণভাবেই ছুঁয়ে ছিল সমকালীন রুশ সমাজ ও রাজনীতির বিতর্কের নানা দিককে। বিপ্লবী সাহিত্যিক চেরনিশেভস্কির 'হোয়াট ইজ টু বি ডান' নামের উপন্যাসটি প্রকাশিত হয় ১৮৬৩ সালে, যা পরে লেনিনকে অত্যন্ত প্রভাবিত করেছিল। এই বইটি লেনিনের এতই পছন্দের ছিল যে তিনি অন্তত পাঁচবার এটি পড়েছিলেন, আর তাঁর এক বিখ্যাত বইয়ের নাম দিয়েছিলেন এই বইয়ের নামে। চেরনিশেভস্কির লেখালেখি ও সম্পাদনাকর্ম সমৃদ্ধ সোভ্রেমেনিক (এই রুশ শব্দটির অর্থ সমসাময়িক) নামের জার্নালটি এ সময়ে প্রগতিশীল মহলে অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে ওঠে এবং এটির লেখক ও সহসম্পাদক হবার কারণে চেরনিশেভস্কিকে কারাবাসও করতে হয়েছিল। উপন্যাস শিল্পের নিরিখে না হলেও সামাজিক প্রভাবের দিক থেকে দেখতে গেলে এই উপন্যাস ও তার প্রতিক্রিয়াসমূহও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মনে করা হয় চেরনিশেভস্কি এই উপন্যাস লিখেছিলেন তুর্গেনিভের 'ফাদার্স অ্যান্ড সন্স'-এর প্রতিক্রিয়ায়, আবার চেরনিশেভস্কির এই

'হোয়াট ইজ টু বি ডান' এর প্রতিক্রিয়াতেই দস্তইয়েফ্স্কি লেখেন তাঁর অতি বিখ্যাত আখ্যান 'নোটস ফ্রম দ্য আন্ডারগ্রাউন্ড'। সাহিত্য আর সামাজিক রাজনৈতিক জীবন তখন রাশিয়ায় পরস্পরের এত কাছাকাছি এসে দাঁড়িয়েছিল যে, একটিকে অন্যটি থেকে কিছুতেই আলাদা করে দেখা বা আলোচনা করা সম্ভব নয়।

পাঠক হিসেবে আমরা এই দশক থেকে শ দেড়েক বছর দূরে দাঁড়িয়ে এখন যখন তল্স্তোয়, দস্তইয়েফ্স্কি, তুর্গেনিভের অসামান্য সাহিত্যকীর্তিগুলো ফিরে পড়ি, তখন আমাদের স্বাভাবিকভাবেই এই আশ্চর্য সময়টাকে, তার বৈশিষ্ট্যগুলোকে সামগ্রিকতায় বোঝার দরকার হয়। নজর ফেরাতে হয় ইতিহাস, সমাজ, রাজনীতির দিকে। দস্তইয়েফ্স্কির 'ক্রাইম অ্যান্ড পানিশমেন্ট', যা বাংলা অনুবাদে 'অপরাধ ও শাস্তি' নামে জনপ্রিয়, আর যার মূল রুশ ভাষায় নাম ছিল, 'প্রেস্তুপ্লেনিয়ে ই নাকাজানিয়ে' তার পাঠে প্রবেশের আগে সেদিকে একটু তাকানো যাক।

রাশিয়ায় প্রায় পাঁচশ বছর ধরে, তৃতীয় ইভানের (১৪৪০-১৫০৫) আমল থেকেই চালু ছিল জারের শাসন। রাশিয়ার সম্রাটরা জার নামে পরিচিত ছিলেন। দেশের অধিকাংশ ভূমি এবং সম্পদ জার, তার পরিবার ও অনুচরদের হাতে কেন্দ্রীভূত ছিল। আর কোটি কোটি জনসাধারণ বাস করত উপযুক্ত শিক্ষা, চিকিৎসা, বাসস্থান, খাদ্য, বিশ্রামবিহীন অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্টের মধ্যে। ইউরোপের অন্যান্য দেশের স্বৈরতন্ত্রগুলোর চেয়েও রাশিয়ার অবস্থা ছিল খারাপ। ১৯০৫ সালের বিক্ষোভ আন্দোলন পর্বের আগ পর্যন্ত রাশিয়ায় কোনো সংবিধান বা (এমনকি রাজতন্ত্র নিয়ন্ত্রণাধীন) সংসদীয় ব্যবস্থার চিহ্নটুকু পর্যন্ত ছিল না। রাজনৈতিক ক্ষমতার পাশাপাশি ধর্মীয় বিষয়ের কর্তৃত্বও ছিল জারের হাতে। জার শাসনের কোনো কোনো পর্বে অবশ্য কিছু কিছু সংস্কার হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমদিকে জার পিটার দ্য গ্রেটের আমল (১৬৮২-১৭২৫) এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। পশ্চিম ইউরোপের সঙ্গে রাশিয়া এসময় সাংস্কৃতিকভাবে অনেকটা কাছাকাছি আসে। মস্কো থেকে রাজধানী সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় সেন্ট পিটার্সবার্গে এবং নতুনভাবে একে গড়ে তোলা হয়। এই আমলে পুরানো মধ্যযুগীয় অনেক ধ্যানধারণাকে সরিয়ে দিয়ে আধুনিক বিজ্ঞানচিন্তার প্রসার হয়। এই সংস্কার অব্যাহত থাকে ক্যাথরিন দ্য গ্রেটের আমলেও (১৭৬২-১৭৯৬)।

জার দ্বিতীয় আলেকজান্ডার আমলের (১৮৫৫-১৮৮১) আগে থেকেই রাশিয়া একের পর এক কৃষক বিদ্রোহে আলোড়িত হচ্ছিল। ১৮৫০ থেকে ১৮৬০-এর মধ্যে রাশিয়া জুড়ে প্রায় আটশ কৃষক বিদ্রোহ হয়। ১৮৬২-র

বসন্তে রাশিয়ার তৎকালীন রাজধানী সেন্ট পিটার্সবার্গে ছাত্রযুব বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠেছিল। এই বিদ্রোহের পেছনে একদিকে ছিল রাশিয়ার ভেতরের সংকট, অন্যদিকে ছিল চৌদ্দ বছর আগে ১৮৪৮-এ ইউরোপের একের পর এক দেশে ওঠা বিদ্রোহের ঢেউয়ের প্রেরণা। ১৮৪৮-এর এই বিদ্রোহ শুরু হয়েছিল ফ্রান্সে এবং ক্রমেই তা ছড়িয়ে পড়ে অনেকগুলো দেশে। পুরানো ধরনের রাজতন্ত্রের জায়গায় জনগণ চেয়েছিল সাংবিধানিক গণতন্ত্র, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, মত প্রকাশের অধিকারসহ বেশকিছু মৌলিক বদল। বেশকিছু দেশে এই বিদ্রোহকে দ্রুত দমন করা হয়, অসংখ্য বিদ্রোহীকে হত্যা করা হয় বা কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়। বেশকিছু দেশে জনগণ বিদ্রোহের মাধ্যমে অনেক অধিকার আদায় করে নিতেও সক্ষম হয়। অস্ট্রিয়া আর হাঙ্গেরিতে ভূমিদাসপ্রথার অবসান হয়, নেদারল্যান্ডসে শুরু হয় প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্র, ডেনমার্কে নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্রের পতন ঘটে। এই বিপ্লবের মধ্য দিয়ে উদারনীতিবাদ, জাতীয়তাবাদ ও সমাজতান্ত্রিক আদর্শ ক্রমশ জনপ্রিয় ও বিস্তৃত হতে থাকে।

জার দ্বিতীয় আলেকজান্ডারের (১৮৫৫-১৮৮১) আমলের প্রথম দিকে ক্রিমিয়ার যুদ্ধে (১৮৫৩-১৮৫৬) রাশিয়ার শোচনীয় পরাজয় ঘটে এবং ক্রমশ জনপ্রিয়তা হারাতে থাকা জার শাসন আরো অনেকটা বেআবরু হয়ে যায়। ফলে তলা থেকে বিদ্রোহের সম্ভাবনাকে প্রশমিত করার জন্য ওপর থেকে কিছু সংস্কারের কথা ভাবা হয় জার শাসনের তরফে। শুরু হয় বহু আলোচিত ভূমিদাস প্রথার বিলুপ্তি (১৮৬১)। প্রায় পাঁচ কোটি মানুষ অর্থাৎ রুশ জনগণের ৮০ শতাংশই এই সংস্কারের ফলে উপকৃত হচ্ছে—একথা বলা হলেও ভূমিদাস প্রথার বিলুপ্তি জনগণের জীবনের মূল সমস্যাগুলোর সমাধান করতে ব্যর্থ হয়। ওপর থেকে লোকদেখানো সংস্কার সত্ত্বেও ভালো ভালো জমিগুলো সবই জমিদারদের হাতে থেকে যায়। কৃষকদের হাতে আসে সামান্য কিছু পতিত বা অনুর্বর জমি। এর সঙ্গেই ছিল চাষিদের জমিতে আবদ্ধ করে রাখার চেষ্টা। অনুমতি না নিয়ে চাষিরা এলাকা ত্যাগ করতে পারত না। ফলে রাশিয়ার বিপ্লবী চিন্তাধারাকে দ্বিতীয় আলেকজান্ডারের সংস্কার প্রশমিত করতে সক্ষম হয়নি।

১৮৩৫ থেকে ১৮৬১-র মধ্যে বিদ্রোহীরা ২৮৩ জন জমিদার বা কুলাককে হত্যা করে। এই বিদ্রোহের পুরোভাগে ছিল নারোদনিক বা জনগণের বন্ধুরা। রাশিয়ায় সামন্ততন্ত্রের দ্রুত অবক্ষয় দেখা যাচ্ছিল, কিন্তু তার জায়গায় আধুনিক পুঁজিবাদ তখনো সেভাবে বিকশিত হয়ে ওঠেনি। ছাত্রযুব এবং জনগণের প্রগতিশীল অংশ সামন্ততন্ত্র এবং জার শাসনের বিরুদ্ধে ক্ষোভে ফেটে পড়ছিল

এবং তা প্রায়শই ব্যক্তিহত্যার পথ বেছে নিত। এরই চরম প্রকাশ দেখা যায় ১৮৮১ সালের ১ মার্চ। সেন্ট পিটার্সবার্গের রাস্তায় জার দ্বিতীয় আলেকজান্ডারকে বোমা ছুড়ে হত্যা করা হয়। ছ' বছর বাদে একইভাবে হত্যার চেষ্টা করা হয় জার তৃতীয় আলেকজান্ডারকে। সেই ব্যর্থ চেষ্টার শাস্তি হিসেবে দু' মাস পর ফাঁসিতে প্রাণ বিসর্জন দেন আলেকজান্দার উলিয়ানভ, সম্পর্কে যিনি ছিলেন ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিনের নিজের দাদা।

১৮৬০-এর রাশিয়ায় বিপ্লবী আদর্শ হিসেবে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে এক নতুন ধরনের চিন্তাধারা—নিহিলিজম। এই মতবাদের পক্ষে-বিপক্ষে কলম ধরেন তুর্গেনিভ, চেরনিশেভস্কি, দস্তইয়েফস্কির মতো সেকালের শ্রেষ্ঠ সাহিত্য প্রতিভারা। পরপর তিন বছরে প্রকাশিত তিনটি ক্লাসিকে নিহিলিজমকে তিনটি আলাদা আলাদা দৃষ্টিকোণে দেখা হয়। ১৮৬২-তে তুর্গেনিভের 'পিতা-পুত্র' উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়। ১৮৬৩-তে তার জবাব হিসেবে চেরনিশেভস্কি লেখেন 'হোয়াট ইজ টু বি ডান' এবং পরের বছর তার প্রতিক্রিয়া লক্ষ করা যায় দস্তইয়েফস্কির বিখ্যাত উপন্যাস 'নোটস ফ্রম দ্য আন্ডারগ্রাউন্ড'-এর মধ্যে। আখ্যানের বাইরে সাহিত্য সমালোচনার জগতেও বিষয়টিকে কেন্দ্র করে বিতর্কের ঝড় বইতে থাকে।

রুশ নিহিলিজমের প্রতিনিধিস্থানীয় চরিত্র হিসেবে বিখ্যাত হয়ে আছে তুর্গেনিভের 'পিতা-পুত্র' উপন্যাসের বাজারভ। উপন্যাসের শুরুতে আমরা দেখি এক জমিদার নিকলাই কির্সানভ অপেক্ষা করছেন তার পুত্র আর্কাদির জন্য। সে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, ছুটিতে পারিবারিক খামারে আসে। আর্কাদি সঙ্গে করে নিয়ে আসে তার সহপাঠী বন্ধু ডাক্তারির ছাত্র বাজারভকে। বাজারভ শুরু থেকেই তার চমকপ্রদ কথাবার্তা ও ধ্যানধারণা দিয়ে যে কারোর ওপর প্রভাব বিস্তারে সক্ষম। বস্তুত আর্কাদি ও অন্যান্য বন্ধুবান্ধবেরা তাকে গুরুর আসনেই প্রায় বসিয়ে রেখেছে। পুত্রবন্ধু এই কড়া ধাঁচের যুবকটিকে জমিদার নিকলাই বেশ সম্ভ্রমের চোখেই দেখেন কিন্তু তার দাদা, এক সময়ের মিলিটারি অফিসার ও উচ্চকোটির সমাজে সাড়া জাগানো মানুষ পাভেল কির্সানভ কথায় কথায় তার সঙ্গে দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়েন। বস্তুত কথার দ্বন্দ্বে তাদের ঠোকাঠুকি একবার ভোরবেলার ডুয়েল অবধি পৌঁছে যায়। বাজারভ অক্ষত থাকলেও গুলি ছুঁয়ে যায় পাভেলের হাঁটু, রক্তক্ষরণ ও ক্ষত নিয়ে ক'দিন বিশ্রামেও থাকতে হয় তাকে।

'পিতা-পুত্র' উপন্যাসটি প্রসঙ্গে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন আলোচকেরা দুটি প্রজন্মের দ্বন্দ্বের কথা তুলেছেন। একটি হল নিকলাই বা পাভেল কির্সানভদের চল্লিশের প্রজন্ম এবং অপরটি হল বাজারভ, আর্কাদিদের ষাটের প্রজন্ম।

শাস্তিভোগ এড়িয়ে গেলেও জীবন তাকে নিষ্কৃতি দেবে না। যে মানসিক যন্ত্রণায় সে ভুগছে, তাই তাকে বয়ে বেড়াতে হবে আবহমান কাল। জীবন্মৃত হয়ে কাটাতে হবে প্রতিটি মুহূর্ত। এই কথাগুলোর মধ্যে সোনিয়ার কথার মিল ছিল, তবে সোনিয়া খ্রিস্টীয় প্রায়শ্চিত্তর ওপর যে জোর আরোপ করেছিল, তা পরফিরি সেভাবে করেনি।

উপন্যাসের ষষ্ঠ পর্বের অনেকগুলো পরিচ্ছেদ জুড়ে আছে সভাইদ্রিগাইলভ। প্রথম ও তৃতীয় পরিচ্ছেদে রাসকলনিকভের সঙ্গে তার কথোপকথন হয় নানা প্রসঙ্গে। চতুর্থ পরিচ্ছেদটি ডুনিয়ার সঙ্গে নাটকীয় সাক্ষাৎ, কথোপকথন, ভীতি ও লোভ প্রদর্শনে পরিপূর্ণ। ভীতি বা লোভ কোনোকিছুর মাধ্যমেই অবশ্য ডুনিয়াকে সে বশ করতে পারেনি এবং আত্মরক্ষার্থে সে পকেট থেকে পিস্তল বের করে গুলি করে খুন পর্যন্ত করতে চেয়েছে সভাইদ্রিগাইলভকে। তার চোখে তীব্র ঘৃণা ছাড়া আর কিছু না দেখে সভাইদ্রিগাইলভ ডুনিয়াকে পাবার আশা চিরতরে ত্যাগ করে এবং নানাজনকে নানাবিধভাবে নিজ সম্পত্তির অংশ দান করে শেষমেশ আত্মহত্যা করে মাথায় গুলি চালিয়ে।

সপ্তম পরিচ্ছেদে রাসকলনিকভ খানিকটা আভাসে মাকে আর স্পষ্টভাবে বোনকে তার অপরাধের কথা খুলে বলে দুজনের থেকেই বিদায় চায়। অষ্টম পরিচ্ছেদে আমরা দেখি রাসকলনিকভের জন্য উদ্বিগ্ন দুই নারী পরস্পরের কাছে বসে আছে। প্রেয়সী সোনিয়া আর বোন ডুনিয়া দুজনেরই আশঙ্কা যে রাসকলনিকভ শেষ পর্যন্ত আত্মহত্যা না করে বসে। শেষ পর্যন্ত সোনিয়াকে আশ্বস্ত করে রাসকলনিকভ তার কাছে আসে, ক্রুশটি চেয়ে নেয় এবং তারপর পুলিশ স্টেশনে গিয়ে তার অপরাধের জবানবন্দি দেয়।

উপন্যাসের উপসংহারে রাসকলনিকভের বিচার, আট বছরের জন্য সাইবেরিয়ার নির্বাসনের দণ্ডাজ্ঞা, সেই নির্বাসনবাস পর্বের নানা অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধি, সোনিয়ার সেখানে থাকা ও তাকে দূর ও কাছ থেকে নিয়মিত দেখার কথা শুনি আমরা। জানতে পারি ডুনিয়া ও রাজুমিহিনের বিয়ের কথাও। আট বছরের নির্বাসন পর্ব শেষে রাসকলনিকভের বয়স হবে বত্রিশ এবং সোনিয়ার সঙ্গে সে আবার নতুন করে জীবন শুরু করতে পারবে এই আশ্বাসের মধ্য দিয়ে উপন্যাসের সমাপ্তি টানেন কথক। এই উপসংহার পর্বটি অবশ্য অনেক সমালোচককে খুশি করতে পারেনি। এ প্রসঙ্গে মনে করা যায় মিখাইল বাখতিনের বিশ্লেষণকে। বাখতিন দস্তইয়েফস্কির উপন্যাসের মহত্ত্বকে খুঁজে পান তার বহুস্বরিকতার মধ্যে। যেখানে কথক-লেখকের নিজস্ব ভাষ্য বা মতামতের চেয়ে প্রধান হয়ে ওঠে চরিত্র পাত্রদের নিজস্বতা। তাদের সংলাপ,

আচার-আচরণ জগৎ ও জীবনের আলাদা আলাদা দৃষ্টিকোণগুলোকে উপস্থাপিত করে। এই বহুস্বরিকতাকে অতিক্রম করে স্রষ্টা দস্তইয়েফ্স্কির খ্রিস্টীয় নৈতিকতার ধারণা রাসকলনিকভের দ্বন্দ্ব ও জটিলতাকে উপসংহারে গ্রাস করেছে বলে বাখতিন খুশি হতে পারেননি। রাসকলনিকভের চরিত্রের ভেতর থেকে খ্রিস্টীয় নীতিবোধের জাগরণকে অনেকেই স্বাভাবিক বলে মানতে পারেননি এবং একে চরিত্রের নিজস্ব বাস্তবতার ওপর লেখকের মনোভঙ্গির সবল আরোপ বলে মনে করেছেন। তবে উপন্যাসের সামগ্রিক সিদ্ধির তুলনায় উপসংহারের শেষ কয়েক পাতাকেন্দ্রিক এই সমালোচনা খুব বড় কোনো বিষয় নয়।

নায়ক রাসকলনিকভকে নিয়ে একটি সামাজিক দার্শনিক তর্কে অবতীর্ণ হয়েছিলেন দস্তইয়েফ্স্কি। কিন্তু নিহিলিজম সংক্রান্ত এই বিতর্কে রাসকলনিকভকে কোনো আইডিয়ামাত্র করে রাখেননি তিনি। এক জীবন্ত রক্তমাংসের মানুষ করে তুলেছেন তাকে। তত্ত্ব আর জীবনের নিজস্ব অনুভূতিমালার দ্বন্দ্বে রাসকলনিকভ আদ্যন্ত দোলায়িত হয়েছে। প্রথমে নিজের লেখা প্রবন্ধে ও খুনের প্রক্রিয়াটির মধ্যে সে তত্ত্বের বাস্তবায়ন ঘটাতে চেয়েছিল। বৃহত্তর মানুষের মহত্তর কল্যাণের জন্য অপরাধ সংঘটনের প্রচলিত গণ্ডি পেরিয়ে যাবার আইডিয়াটিকে বাস্তবায়িত করার পর সে দেখতে পেল জীবনের টান তত্ত্বের ধরনে চলল না। অকম্পিতভাবে অপরাধকে হজম করে নেবার তত্ত্বটি বাস্তবের মাটিতে ছারখার হয়ে গেল। ধূলিসাৎ হয়ে গেল নিহিলিস্টিক আইডিয়ার নির্মিত সৌধটি।

রাসকলনিকভের সংকট ও যন্ত্রণাকে, যুক্তি ও আবেগকে পাঠক প্রতি মুহূর্তে উপলব্ধি করতে পারেন বলেই সে এত জীবন্ত হয়ে উঠেছে। এর পেছনে রয়েছে আখ্যান নির্মাণে দস্তইয়েফ্স্কির অসামান্য কৃৎকৌশল। সর্বজ্ঞ ও সর্বগ ঔপন্যাসিক এখানে পাঠককে বর্ণনা করে সবকিছু জানান না। বরং রাসকলনিকভের সক্রিয়তা পাঠকের সামনে খোলা থাকে। হাজির থাকে রাসকলনিকভ সম্পর্কে নানাজনের চিন্তাভাবনা, বিশ্লেষণ ও তাকে ঘিরে কথোপকথন। এভাবেই নায়কের নির্মাণকে জীবন্ত ও অনুভূতিবেদ্য করে তোলেন ঔপন্যাসিক। বিশিষ্ট উপন্যাসকল্পনার সঙ্গে নির্মাণের এই অসামান্য যুগলবন্দি উপন্যাসটিকে পৌঁছে দেয় সাফল্যের শিখরস্পর্শী উচ্চতায়।

সৌভিক ঘোষাল

অপরাধ ও শাস্তি

প্রথম খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

জুলাই মাসের বিকেল। সেদিন অস্বাভাবিক গরম। এমনি দিনে এক যুবক এস. প্লেসের চিলেকোঠা থেকে নেমে কিঞ্চিৎ দ্বিধাগ্রস্তভাবে ধীরে ধীরে কে. পুলের দিকে এগুতে লাগল।

সিঁড়ি দিয়ে নামার সময় ভাগ্যিস বাড়িওয়ালির সঙ্গে দেখা হয়নি। কোনোরকমে এড়িয়ে এসেছে। উঁচু পাঁচ-তলা বাড়িটার ছাদের উপর চিলেকোঠায় সে থাকে—ওটাকে কামরা না বলে আলমারি বললেই ঠিক হয়। বাড়িওয়ালি তাকে এই চিলেকোঠায় থাকতে দিয়েছে, খেতে দেয়, অন্য কাজ-কমও করে দেয়। বাড়িওয়ালি নিজে থাকে নিচের তলায়। বেরোবার সময় বাবুর্চিখানার সামনে দিয়ে যেতে হয়। এ ঘরের দোর আবার সর্বদাই খোলা থাকে। এখান দিয়ে যাবার সময় প্রত্যেকবার যুবকটির কেমন যেন বুক দুরদুর করে, মন অস্বস্তিতে ভরে যায়; কপাল কুঁচকে ওঠে; লজ্জায় যেন কুঁকড়ে যায়। বাড়িওয়ালির কাছে তার প্রচুর দেনা। তাই দেখা করতে ভয় হয়।

আসলে সে যে কাপুরুষ বা নীচ, তা নয়। বরঞ্চ, ঠিক বিপরীত। কিছুদিন যাবত অতিরিক্ত দুশ্চিন্তায় তার মেজাজ খিটখিটে হয়ে গিয়েছে। শুধু বাড়িওয়ালি বলে নয়, কারো সঙ্গে দেখা করতেও যেন তার ভয় হয়। তাই সে একা, নিঃসঙ্গ থাকে। দারিদ্র্যের কঠোর নিষ্পেষণে সে ভেঙে চুরমার হয়ে গিয়েছে। এত যে দুশ্চিন্তা, এত যে হীন অবস্থা—সে-সব কথা ভাবার ক্ষমতাও আর তার নাই। দরকারি কাজের দিকে মনোযোগ দেওয়া ছেড়ে দিয়েছিল—দেবার ইচ্ছাও আর হত না। তবু, ঐ সিঁড়ি দিয়ে নামার সময় বাড়িওয়ালি যে পথ আটকে নানা তুচ্ছ অবান্তর কথা শুনতে তাকে বাধ্য করবে, টাকার তাগাদা করবে, ভয় দেখাবে—আর এজন্য মিথ্যে কৈফিয়ত তৈরি করার জন্য মস্তিষ্ক বিব্রত করতে হবে তাকে—এ তার পক্ষে অসহনীয় হয়ে পড়েছিল। তার চাইতে বিড়ালের মতো নিঃশব্দে লঘুপায়ে বুড়িকে এড়িয়ে যাওয়াই বরঞ্চ ভালো।

কিন্তু সেদিন সন্ধ্যায় রাস্তায় চলতে চলতে সে বুঝল, সত্যিই সে ভয় পাচ্ছে।

'বা রে, এমন একটা কাজ করতে যাচ্ছি, অথচ এই তুচ্ছ ব্যাপারেই ভয় পাচ্ছি?' কথাটি মনে হতেই তার মুখে বিদ্‌ঘুটে ধরনের হাসি দেখা দিল। একটা প্রবাদ বাক্য তার মনে পড়ল, 'কাপুরুষেরাই সুযোগ হারায়; নইলে মানুষ সব কাজই ফতে করতে পারে।' 'হুঁ, মানুষ সব চাইতে ভয় পায় কীসে, একবার জানতে পারলে হত!...কী আশ্চর্য! বেজায় কথা বলছি যে! হ্যাঁ, শুধু বকবক করি বলেই তো কোনো কাজ করতে পারি না। আবার, এমনও তো হতে পারে যে, কোনো কাজ করি না বলেই শুধু বকবক করি। দিনের পর দিন ঐ গর্তের মধ্যে থেকে হামেশা দেও-দানবের কথা ভাবতে ভাবতে মাস খানেক যাবত এই রকম বকবক করতে শুরু করেছি।...আচ্ছা, এখনই বা আমি ওখানে যাচ্ছি কেন? ও-কাজ করার ক্ষমতা আমার আছে তো? সত্যিই কি আমি সেরকম স্থির-সংকল্প হয়েছি? কই—তা তো মনে হচ্ছে না! নাঃ, সবই শুধু কল্পনা—নিজেকে নিয়ে খেলা করছি—হ্যাঁ, খেলা নয়তো কী?'

রাস্তায় অতিরিক্ত গরম। কোথাও বাতাসের এতটুকু নিশানা নাই। রাস্তার দু'দিকের বাড়ির দেওয়ালে পলস্তারা দিচ্ছে; ভারা বাঁধা রয়েছে; জায়গায় জায়গায় ইট ও ধুলোর স্তূপ। গ্রীষ্মকালে সেন্ট পিটার্সবার্গের বাসিন্দাদের অতি-পরিচিত দুর্গন্ধ বাতাসে মিশে আছে। একে তো তার অবসন্ন মন; তার উপর এই পরিবেশ। এই গুরুভারে যুবকটির মন আরো অবসাদগ্রস্ত, আরো প্রাণহীন হয়ে উঠেছে। শহরের এই এলাকায় শুঁড়িখানার সংখ্যা খুব বেশি। সেগুলো থেকে অসহনীয় দুর্গন্ধ বেরুচ্ছে।

কাজের দিনেও এখানকার রাস্তায় মাতালদের অবিরাম আনাগোনা। অসংখ্য শুঁড়িখানার অসহনীয় দুর্গন্ধে জায়গাটা একেবারে দোজখ হয়ে গিয়েছে। মুহূর্তের জন্য যুবকের মার্জিত মুখের উপর গভীর বিতৃষ্ণার চিহ্ন ফুটে উঠল। যুবকটি অসাধারণ সুন্দর দেখতে। মাঝারি অপেক্ষা একটু লম্বা; একহারা সুপুষ্ট দেহ; গভীর পিঙ্গলবর্ণ চুল। চলতে চলতে সে গভীর চিন্তামগ্ন হল। আপন মনেই যেন নিজের শূন্য মনের সঙ্গে কথা বলছে। শূন্য দৃষ্টিতে দেখতে দেখতে এগিয়ে চলছে সে—যেন সবকিছু দেখছে, অথচ সত্যিকার কিছুই দেখছে না। মাঝে মাঝে বিড়বিড় করে আপন মনে কথা বলছিল। এই সময় সে বুঝতে পারছিল যে, তার চিন্তা অসংলগ্ন, শরীর অত্যন্ত দুর্বল। দু'দিন যাবত সে কিছু খেতে পায়নি বললেও চলে।

তার পোশাক এতই খারাপ যে, যারা নিতান্ত খারাপ পোশাক পরে তারাও এমন ছেঁড়া কাপড় দেখে লজ্জাবোধ করবে। তবে সুবিধের কথা, এই রাস্তায়

পোশাকের ভালো-মন্দ নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না। হে মার্কেটের নিকটবর্তী বলে এ অঞ্চল বদলোকদের আড্ডার সংখ্যা খুব বেশি। পিটার্সবার্গের এই অঞ্চলের অলি-গলিতে ব্যবসায়ী ও শ্রমিকে ভর্তি। নানা ধরনের লোক এই অঞ্চলে আনাগোনা করে। বিসদৃশ কিছু দেখলেও কেউ আশ্চর্য হয় না। যৌবনের রুচিবাগীশতা সত্যেও যুবকের অন্তরে এত তিক্ততা ও ঘৃণা জমেছিল যে, সে ছেঁড়া পোশাক পরে রাস্তায় বেরোতেও কোনো দ্বিধাবোধ করছিল না। অবশ্য, পূর্ব-পরিচিত সহপাঠীদের সঙ্গে দেখা হলে তার মনোভাব অন্যরকম হত। তাই সে তাদের কারো সঙ্গে দেখা হওয়া পছন্দ করত না। তবু এক মালবাহী ঘোড়ার গাড়ির উপর বসে এক মাতাল যেতে যেতে যখন তার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে চেঁচিয়ে উঠলো, 'ওহে জার্মান টুপি-ওয়ালা মানুষটি'—তখন সে অকস্মাৎ থেমে দ্বিধাভরে মাথার টুপিটা চেপে ধরলো। টুপিটা উঁচু, গোলাকার। জিমারম্যানের দোকান থেকে খরিদ; কিন্তু এখন ছিঁড়ে সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে গিয়েছে। টুপির একদিক একেবারে বেঁকে গিয়েছে। লজ্জার পরিবর্তে এক প্রকার ভীতি তার মন আচ্ছন্ন করে দিল।

অপ্রতিভ হয়ে বিড়বিড় করে বললো, 'ও আমি জানতাম; এরকম হবে, তাও বুঝেছিলাম। সর্বনাশ! এরকম খুঁটিনাটি বিষয়ের দিকে নজর দিলে তো মতলব ভেস্তে যাবে। হুঁ, আমার টুপিটা লোকের চোখে পড়ে। খারাপ বলেই চোখে পড়ে। আমার ছেঁড়া কাপড়ের সঙ্গে গোল টুপি পরাই উচিত। এরকম বিসদৃশ জিনিস পরা উচিত নয়। এরকম টুপি কেউ পরে না। কারণ মাইল খানেক দূর থেকেও এটা চেনা যায়। দেখলে লোকে মনে রাখবে...আচ্ছা, দেখলেই বা ক্ষতি কী? না, এই থেকেই তো ওরা সূত্র খুঁজে পাবে। এরকম কাজ করতে হলে লোকে যাতে চিনতে না পারে, সেই রকম হয়ে যেতে হয়। খুঁটিনাটি ব্যাপারগুলোই তো বড় হয়ে ওঠে। সামান্য ব্যাপারে সব নষ্ট হয়ে যায়।...'

তাকে বেশিদূর যেতে হবে না। বাসা থেকে গন্তব্য স্থানের দূরত্ব সে জানতো—ঠিক সাতশ ত্রিশ পা। একবার আনমনে সে এই দূরত্ব মাপ করেছিল। তখন সেই কামনার উপর কোনো গুরুত্ব দেয় নাই—সেটা একটা দুঃসাহসিক খেয়াল বলে মনে করেছিল। এখন, এক মাস পরে সে বিষয়টিকে অন্য চোখে দেখতে শুরু করেছে। নিজেকে অজান্তেই সে সেই ভীষণ স্বপ্নকে বাস্তবে রূপায়িত করার যোগ্য মনে করছিল। এখন সে মহড়া দিতে চলেছে। প্রতি পদক্ষেপের সঙ্গে তার উত্তেজনা ক্রমশ বৃদ্ধি হচ্ছিল।

একটা মস্ত বড় বাড়িতে সে প্রবেশ করল। এখন তার বুক ঢিপঢিপ করছে, দেহের সমস্ত স্নায়ুতে কাঁপুনি ধরেছে। বাড়িটার একদিকে খাল, অন্যদিকে

রাস্তা। দর্জি, তালা মেরামতের মিস্ত্রি, বাবুর্চি, নানা রকমের জার্মান, কোনোরকমে রুজি-রোজগার-করা মেয়েরা, সামান্য কেরানি প্রভৃতি নানা ধরনের লোক এই বাড়িটাতে ঘর ভাড়া নিয়ে থাকে। দুটো দরজা ও দুটো উঠান দিয়ে অনবরত লোক যাতায়াত করছে। তিনচার জন দারোয়ান আছে বাড়িটাতে। কারো সঙ্গে দেখা না হওয়ায় যুবকটি খুশিমনে বাড়ির ভিতর চলে গেল ও অন্যের অলক্ষ্যে ডান দিকের সিঁড়ি দিয়ে ওপরে ওঠলো। সিঁড়িটা বাড়ির পিছন দিকে—সংকীর্ণ, অন্ধকার—তার পরিচিত; পথ তার জানা। পরিবেশ দেখে সে খুশি হল। এরকম অন্ধকারে কারো সপ্রশ্ন দৃষ্টিকে ভয় করার কারণ নাই।

চারতলায় উঠে সে নিজেকেই প্রশ্ন না করে পারল না—'এখনই যদি এত ভয় পাই, তা হলে মতলব হাসিল করব কী করে? সেখানে জন কতক কুলি একটা কামরা থেকে জিনিসপত্র বের করছিল। তাতে তার পথ আটকে গেল। সে জানতো, এই ফ্ল্যাটে একটি জার্মান কেরানি সপরিবারে বাস করত। ভাবলো : তাহলে জার্মানটা যখন চলে যাচ্ছে, তখন এই তলায় বুড়ি ছাড়া আর কেউ থাকছে না। 'ভালোই হল'—ভাবতে ভাবতে সে বুড়ির ফ্ল্যাটের ঘণ্টা বাজাল। একটা ক্ষীণ শব্দ হল—ঘণ্টাটি যেন তামার বদলে টিন দিয়ে তৈরি। এই ধরনের বাড়ির ছোট ছোট ফ্ল্যাটের ঘণ্টা এই রকমেই বাজে। ঘণ্টার শব্দ শুনে তার কী যেন একটা কথা মনে পড়ে গেল।...সে চমকে ওঠলো। তার স্নায়ু চঞ্চল হয়ে উঠলো। একটু পরেই দরজাটা সামান্য ফাঁক হল। বুড়ি সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাল। অন্ধকারে বুড়ির চোখের জ্বলজ্বলে দৃষ্টি ছাড়া আর কিছু দেখা যাচ্ছিল না। সিঁড়ির কাছে কতকগুলো লোক রয়েছে দেখে বুড়ি সাহস করে দরজা খুলে দিল। যুবকটি অন্ধকারের মধ্যেই ভিতরে প্রবেশ করল। বুড়ি নীরবে তার দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। ষাট বছর বয়স্কা শীর্ণকায় ছোটখাটো বুড়ি। বিদ্বেষ-ভরা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি তার; ছোট নাক। খোঁচা খোঁচা বেরং চুলে তেল দেওয়া—মাথায় রুমাল নাই। পা দুটো মুরগির পায়ের মতো শীর্ণ, লম্বা; গলায় এই গরমেও ফ্লানেলের টুকরো জড়ানো; কাঁধে চাদর; মাথায় পুরানো দুমড়ানো পশু-লোমের টুপি। বুড়ি প্রত্যেক মুহূর্তে কাশছিল। যুবকের দৃষ্টিতে নিশ্চয়ই এমন কিছু ছিল, যে কারণে বুড়ির চোখে সন্দেহের ছায়া দেখা দিল।

যুবকটির মনে পড়ল, তার আরও ভদ্র ব্যবহার করা দরকার। একটু নুয়ে তাড়াতাড়ি বলল, 'আমার নাম রাসকলনিকভ। আমি ছাত্র। মাস খানেক আগে এখানে এসেছিলাম।'

বুড়ি তার মুখের ওপর দৃষ্টি রেখে পরিষ্কার কণ্ঠে বললো, 'আপনি যে এসেছিলেন সে কথা আমার মনে আছে।'